❖ জীবনদেবতা কবিতার তথ্যসহ মূল বিষয়বস্তুর পরিচয় দাও।

তমাল কান্তি পাল

ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৯ শে মাঘ জীবনদেবতা কবিতাটি রচিত ও চিত্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত কবিতা। চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ১২৯৯ চৈত্র থেকে ১৩০২ ফাল্গুন সময়সীমার মধ্যে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের আগে কবির বিখ্যাত সোনার তরী প্রকাশিত হয়। সোনার তরী কাব্যের মানস সুন্দরী ও নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতা দুটির মধ্যে আমরা কবির দুটির মধ্যে আমরা কবির অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতি অনুধ্যান ও অসীমের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করেছি সেই অনন্ত রহস্যময়ী নারীরূপের মধ্যে কবির অন্তরতম বঁধুকে। ঝুলন কবিতায় সেই বঁধুকে তিনি নতুন করে পেয়েছেন। সুতরাং চিত্রা কাব্যগ্রন্থের জীবন দেবতা কবিতার পূর্বেই সোনার তরী কাব্যের মানস সুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা ও ঝুলন কবিতাত্রয়ে জীবন দেবতার বঁধুর প্রবেশক বা প্রাকভাস পাই। যদিও সোনার তরীতে জীবন দেবতার পূর্ণভাব নেই, আছে কল্পনামূর্তি। কারণ মানস সুন্দরী কবিতায় অদৃশ্য রহস্যময়ীর অনুভূতি আছে, যার হাতে কবির জীবন তরণীর হাল মুঠোর মধ্যে কিন্তু কি কথা বলিছে কিছু নারী বুঝিবারে এমন রোমান্টিকতা রয়েছে। নিরুদ্দেশ যাত্রায় সেই রহস্যময়ী সুন্দরীর সঙ্গে কবি অভিসারে যাচ্ছেন, চারিদিক আশা-স্বপ্ন মাখা রহস্যময় জল, কিন্তু কবির আয়ত্তের মধ্যে তিনি নেই। ঝুলনে বধুকে পেয়ে কবির হৃদয় পূর্ণ, মত্ত দোলায় বধুর কুন্তল আঁচলের স্পর্শ পাচ্ছেন- ঠিক সোনার তরী কবিতাটির গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারের মত। মনে হয় চেনেন, কিন্তু স্পষ্ট নয় সে চেনা। চিত্রার অন্তর্যামী কবিতার প্রথমে সেই রহস্যময়ী সুন্দরী কে কবিতার বিষয়ের মধ্যে পেলেন কবি। আর জীবনদেবতা কবিতায় সেই বিষয় হয়ে উঠেছে কবির ভাবনা নিয়ন্ত্রক, অনুপ্রেরক সর্বোপরি অন্তরতম প্রাণেশ।

উল্লেখ্য যে, চিত্রা কাব্যের আগে সোনার তরী কাব্য রবীন্দ্রনাথের এমন একটি কাব্য পর্যায় যা কে প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ মনে করেন কবির পরিনতি পর্বের সূচক। এই কথাটি সোনার তরীর আগের কাব্য মানসী সম্বন্ধে বলেন না। যদিও মানসী থেকে সোনার তরীর পরিণতি লাভ ঘটেছে। আসলে, সোনার তরী পর্বে পদ্মা নদীর প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ এ কালে তিনি অধুনা বাংলাদেশের শিলাইদহ- পতিসরে থাকতেন পদ্মার সৌন্দর্য, তার গতি কবিকে ভাবিত করে। তিনি ছিন্নপত্রে লিখেছেন- কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয় হয়তো দুধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখা মাত্র চলে গেছে কিন্তু ক্রমাগতই চলছে, এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। এই যে চলমানতা এতে বিরাম নেই, বিরতি নেই, তা অবিচ্ছেদ্য ফলে, মানব জীবনেও ক্রমাগত যাওয়া আসা, সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই যাওয়া আসার ফাঁকে গড়ে ওঠে বিরহ বেদনা। তৃণ ক্ষুদ্র অতি তাকেও

যেন মাতা বসুমতী প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখে। তবু, যেতে দিতে হয়। কারণ, কালের স্রোত। ফলে, পদ্মাতীরের অভিজ্ঞতায় কবি মানব জীবনকেও দেখলেন- সে ক্রমাগত দূরে চলে যায়, ঠিক নদীর স্রোতের মত। ১৪৭ সংখ্যক পত্রে কবি লিখেছেন- ‘‘পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে... আগাগোড়া একটা প্রকাণ্ড প্রচন্ড ধাবমান গতি...। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিতাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। চিত্রা কাব্যে ঠিক সোনার তরী পদ্মার মত ভূমিকা নিয়েছে জীবনদেবতা। তাই চিত্রার জীবনদেবতা একটি অন্যতম রবীন্দ্র কবিতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।